জমির মূল্য ঃ ব্যক্ত অব্যক্ত ও উদ্বৃত্ত

রবীন মজুমদার

মার্ক্সবাদের অন্যতম তাত্বিক ভিত্তি হল শ্রমের উদ্বৃত্তমূল্য। এর মোদ্দা কথাটি প্রায় সবাই জানেন — শিল্পপতি/পুঁজিপতি শ্রমিকদের শুধুমাত্র কোনমতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যটুকুই ফেরৎ দেন। অথচ শ্রমসৃস্ট মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। শ্রমের এই উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করেই জমে ওঠে মূলধন, সেই মূলধন বিনিয়োগ করে তৈরী হয় আরও উদ্বৃত্তমূল্য, আরও মূলধন, আরও বিনিয়োগ। শিল্পের উৎপাদন বাড়ে, আয় বাড়ে। বাড়ে জাতীয় আয়ও, কিন্তু শ্রমিকের অবস্থার মৌলিক উন্নতি হয় না। শিল্পোৎপাদনে অবশ্য শ্রম ছাড়াও দরকার হয় আরও দুটি উপাদানের - পুঁজি ও জমি। পন্থার হদিস দিচ্ছেন, যার সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে যে জমিরও উদ্বৃত্তমূল্য সম্ভব। এবং শ্রমের মতই জমির উদ্বৃত্তমূল্যও আত্মসাৎ করেন প্রধানত শিল্পপতিরাই (যদি জমি শিল্পে ব্যবহৃত হয়) - বঞ্চিত হয় পুরনো জমি-ব্যবহারকারীরা, বঞ্চিত হয় সমাজ এবং পরিবেশ।

বস্তুতঃ শুধু জমি নয়, আজকের দিনের বিজ্ঞানের আলোকে জল, বাতাস এবং জীববৈচিত্র্যকেও (Water, Air and Biodiversity) এই আলোচনায় আনা উচিত। কারণ শিল্প-উৎপাদনে এগুলিও প্রয়োজন। এগুলিকেও শিল্প

অন্যান্য জমিকে শিল্পের জমিতে পরিণত করতে গেলে জমির সূত্রেই যে একটি উদ্বৃত্তমূল্যের উদ্ভব হয় সেটা বোঝার ও মেনে নেবার সময় এসে গেছে। কৃষির তুলনায় শিল্পে আয় বেশী হবার রহস্য লুকিয়ে আছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিরাট মূলধনকে শিল্পে আত্মসাৎ করার মধ্যে, এবং ইকোসিস্টেম তথা পরিবেশ পরিষেবাগুলোকে বেমালুম গায়েব করে ফেলার মধ্যে।

এই তত্বকে হাতিয়ার করেই বিশ্বজুড়ে মার্কস অনুগামীরা শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন ও লড়াইতে সামিল হন। এক সময় জোরালো সওয়াল উঠেছিল যে শিল্পোৎপাদনের উপাদান তিনটি নয় চারটি। শ্রম, জমি মূলধন ছাড়াও শিল্পোদ্যোগও (Enterpreneurship) একটি অপরিহার্য উপাদান। সে প্রশ্নের কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নি।

শ্রম এবং জমির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গেও মার্কসবাদ তেমন আলোকপাত করতে পারেনি। শিল্প উৎপাদনে জমি কি কোনোভাবে কোন উদ্বৃত্তমূল্য যোগ করতে পারে? যদি করে, তবে কে বা কারা তা ভোগ করে? এসব প্রশ্নের সদুত্তরের হদিস তখনই পাওয়া সম্ভব যখন গ্রহণযোগ্য কোনো পন্থা-পদ্ধতিতে জমির প্রকৃত ও পরিমাণগত মূল্যায়ণ করা যাবে। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত বাস্তুবিজ্ঞান (ইকোলজি) এবং পরিবেশ অর্থনীতি (এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্স) - এ ব্যাপারে নিস্পত্তির পথে অনেকটাই এগিয়েছে। বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞরা জমির মূল্যায়ণ-

উৎপাদনের উপাদান বলে গণ্য করা যায়। শিল্প উৎপাদনের উপাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে তার একটি বাজার (দর) থাকে। জল এবং জীববৈচিত্র্যের (অর্থাৎ জৈবদ্রব্যাদি - উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত, শিল্পের কাঁচামাল) যে বাজার আছে তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কার্বন-বাণিজ্যের মোড়কে এখন বাতাস তথা বায়ুমন্ডলও বাজারী লেন-দেনে ঢুকে পড়েছে। ক্ষমতা ও অর্থবান দেশরা এখন প্রতি টন কার্বন ড্রাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে দাম দিচ্ছে অথবা প্রতি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে না ছাড়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে মূল্য উশুল করতে পারছে। অর্থাৎ বাতাস তথা আকাশও বাজারভুক্ত এবং শিল্প-উৎপাদনের উপাদান তথা হাতিয়ার।

জমির প্রকৃত মূল্য ঃ নতুন দিগন্ত

এ নিবন্ধে আমরা শুধু জমিতেই থাকতে চাই। এবং দেখতে চাই যে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তত্ব - তথ্যের নিরিখে, জমির মূল্যায়ণ কিভাবে করা যায়, জমির উদ্বৃত্তমূল্য থাকতে পারে

কিনা বা থাকলে তা কোথায় যায়।

জমি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছিল যে তা এক ভুখন্ড মাত্র যেখানে ফসল ফলানো যায় বা বাড়ীঘর কল-কারখানা তৈরী করা যায়। উনিশ শতকের শেষদিকে জমিকে এভাবেই দেখা হতো এবং ১৮৯৪ সালে প্রণীত ভারতের জমি অধিগ্রহণ আইন এরকম ধারণাকে আত্মস্থ করেই তৈরী হয়েছিল - এমনটা ভাবা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু আজও এই আইন অসংশোধিতভাবে প্রয়োগ করলে তা হবে ভয়ঙ্কর কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট, শুধু একারণেই নয় যে উপনিবেশ-শাসক ইংরেজরা এই আইন প্রণয়ণ করেছিল একশো বছরেও বেশী আগে, বরং আরও এই কারণে যে এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে বিগত কয়েক দশকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিজ্ঞান ভৌম এবং অন্যান্য বাস্তুসংস্থানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অনেক ঘনিষ্ঠ তথ্যাদি উপস্থাপিত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন অনেক গভীর ও বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান (ইকোসিস্টেম) সম্পর্কিত অর্থনীতিও চর্চার একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা নিরন্তর প্রয়াস পাচ্ছেন 'ইকোসিস্টেম পরিষেবা ও প্রাকৃতিক মূলধনের'' হিসাব নিকাশ করার। 'ইকোসিস্টেম পরিষেবা ও প্রাকৃতিক মূলধন'' কথাটা নেওয়া হয়েছে কস্টাঞ্জা এবং আরও ১২ জনের লিখিত একটি গবেষণাপত্র থেকে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত 'নেচার' প্রত্রিকায়, ১৯৯৭ সালে [The value of the World's Ecosytem Services and Natural Capital - R. Costanza and others, Nature, Vol. 387, p.253, 1997]। এই গবেষণাপত্রে লেখকরা প্রাকৃতিক ১৩ প্রকার ইকোসিস্টেম (যেমন সামুদ্রিক, উপকূলীয়, আরণ্যক, চারণভূমি ইত্যাদি ইকোসিস্টেম) এবং সেগুলির ১৭ প্রকার পরিষেবাকে চিহ্নিত ও মূল্যায়ণ করেছেন। ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন শতাধিক প্রকাশিত গবেষণাপত্র এবং নিজেদের সংগৃহীত কিছু তথ্যকে। চমকে দেবার মতই ফল বেরিয়ে এল - সমগ্র পৃথিবীর সব ধরণের ইকোসিস্টেমগুলির মোট বার্ষিক পরিষেবার (উৎপাদন সহ) মূল্য যেখানে দাঁড়ালো ৩৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = $১০^{১২}$ অর্থাৎ ১লক্ষ কোটি) যেখানে ঐসময়েই পৃথিবীর ১৯৪ টি দেশের বার্ষিক মোট উৎপাদন (GDP) হল প্রায় তার অর্ধেক। মাত্র ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার! গবেষণাপত্রটিতে আরও প্রকাশ পেল যে প্রায় প্রতিটি ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, সামগ্রিক মূল্যের ভগ্নাংশ মাত্র। শস্যক্ষেত্র ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে, গবেষকরা দেখালেন, ১৭ টির মধ্যে ১৫ টি পরিষেবা ক্রিয়াশীল, কিন্তু সেসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ঘাটতি আছে। এর পরে এই বিষয় নিয়ে অনেক দেশেই জোরদার গবেষণা শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাদা জার্নালও প্রকাশ হতে থাকে। ২০০৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে সারা পৃথিবীর ১৩০০ বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে প্রকাশিত হয় 'দ্য মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্টস্ক্স (The Millennium Ecosystem Assessment) রিপোর্ট। এতে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন মহাদেশের কোণে কোণে ঘটে চলা বহু বহু উদাহরণ - কিভাবে প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম পরিষেবাগুলি মানুষের অবহেলা, উপেক্ষা, উন্নয়নের অত্যাচারের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, আর সেসব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষই, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষরা। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর পরই লন্ডনে জড়ো হয়েছিলেন প্রখ্যাত একদল পরিবেশ অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ। দুদিনের পর্যালোচনা শেষে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার পার্থ দাশগুপ্ত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলেন — জাতীয় লাভ ক্ষতির হিসেবের খাতায় প্রাকৃতিক উৎপাদন ও পরিষেবাকে স্থান দিলে তবেই দারিদ্র-কে ইতিহাসে পরিণত করা যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের উদাহরণ তুলে তিনি বলেন ১৯৭০- এর দশক থেকেই এই অঞ্চল মোট জাতীয় উৎপাদনের (GDP) নিরিখে ক্রমাগত ধনী হয়ে উঠছে, কিন্তু বাস্তবে মাথাপিছু সম্পদের (Wealth) পরিমাণ কমেই চলেছে, কারণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক মূলধন (Natural Capital) তছনছ করা হচ্ছে।

বিশেষ বিশেষ ইকোসিস্টেমের মূল্যায়ণ প্রয়াস যদিও চলছে এবং বিস্তৃতও হচ্ছে, শস্যক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা এখনও যথেষ্ট নয়। শস্যক্ষেত্রও আবার একরকমের নয়। শস্য-উৎপাদন হয় এমন যে কোন ভূক্ষেত্রই শস্যক্ষেত্র। কিন্তু এদের

কোনটি যদি হয় পুরোপুরি প্রাকৃতিক, অধিকাংশই আধা বা আংশিক প্রাকৃতিক, যেখানে বিভিন্ন প্রকরণে ও মাত্রায় মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে যতটুকু জানা যায়, প্রায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক শস্যক্ষেত্রে খাদ্য (ফসল) উৎপাদন, সামগ্রিক মূল্যের মাত্র এক শতাংশ মত। কিন্তু মানুষ যেখানে প্রচুর পরিমাণ বাড়তি শক্তি যোগান দেয় (বীজ, সার, সেচ, কর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে) সেখানে শস্য উৎপাদন ৩০ শতাংশেরও বেশী হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের সাহায্য এইসব শস্যক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিষেবার স্থান গ্রহণ করে বা একটির পরিবর্তে অন্য পরিষেবা বাড়াতে মদৎ যোগায় এবং মোট মূল্যের নিরিখে উৎপাদনের অংশ বেড়ে যায়।

বিষয়টিকে সহজ করে বোঝবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রণীত ও প্রকাশিত নবম শ্রেণীর চালু পাঠ্যপুস্তক ''পরিবেশ পরিচয়ের'' শরণ নিতে পারি। এতে (পৃঃ ২৭-২৮) ৫০ বছরের পরিণত একটি বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, কাঠের মূল্যেই গাছটি হয়তো বাজারে বিকোয়, কিন্তু পরিবেশের মধ্যে থাকা অবস্থায় ঐ গাছটি ইকোসিস্টেমের অঙ্গ হিসেবে যে পরিষেবা ও দ্রব্যাদি দেয় তার মূল্য বাজারে কোন স্বীকৃতিই পায় না। অথচ কাঠের মূল্য সামগ্রিক মূল্যের এক শতাংশেরও কম, মাত্র ০.৮ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯৯.২ শতাংশ মূল্যের উৎস হল বৃক্ষটির প্রাকৃতিক (ইকোসিস্টেম) পরিষেবা, যার মধ্যে ধরতে হবে মৃত্তিকা গঠন ও ক্ষয়রোধ, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের বায়ুমন্ডলীয় ভারসাম্য বজায় রাখা, পৌষ্টিক উপাদানগুলির পুনশ্চক্রায়ন (Recycling), পরাগসঞ্চার, নান্দনিক সৌন্দর্য বিধান ইত্যাদি। গাছটি বেচে হয়তো পাওয়া যাবে মাত্রই ১০,০০০ টাকা, কিন্তু এই পরিষেবাগুলির জন্য গাছটির মূল্য হওয়া উচিত পনের লক্ষ টাকা, কেননা এই পরিমাণ টাকাই খরচ করতে হবে, গাছের দেওয়া পরিষেবাগুলি পেতে। ডঃ তারকমোহন দাস ১৯৮০ সালে এরকম একটি মূল্যায়ণ প্রথম তুলে ধরেছিলেন, অনেকের হয়তো মনে পড়বে।

বাজারদর বনাম ক্ষতিপূরণ

বৃক্ষের মতো জমিও নানারকম পরিবেশ পরিষেবা দেয়, অথচ বাজারে জমির মূল্যে তার স্বীকৃতি নেই। বৃক্ষের মতই জমিরও প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সিঙ্গুরের যে জমিকে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে টাটাদের লিজ দিয়েছিলেন, সেটাকে একটা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে আমরা ঐ জমির মূল্যায়ণের প্রয়াস পেতে পারি। এখন তো সবাই আমরা জানি যে সিঙ্গুরের জমির জন্য কৃষকদের একর প্রতি ৮-১২ লক্ষ টাকা ''ক্ষতিপূরণ'' দেওয়া হয়েছিল এবং আইনী নির্দেশ মোতাবেক ''ক্ষতিপূরণের'' এই অঙ্ক জমির বাজার দরের ভিত্তিতেই স্থিরিকৃত হয়েছিল বলে সরকারের দাবী। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা এই ক্ষতিপূরণটাকে একর প্রতি ১০ লক্ষ টাকা ধরে নিতে পারি।

এখন, কৃষিজমির বাজার দরের সঙ্গে জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের বাজার দরের সরাসরি সম্পর্কও অবশ্যই আছে। কৃষিজমি শস্যক্ষেত্র (Cropland) ইকোসিস্টেম। সিঙ্গুরের কৃষিজমি পুরোপুরি প্রাকৃতিক নয়। আবার তা অতি- উন্নত আধুনিক শিল্প-কৃষিরও নিদর্শন নয়। বাইরের শক্তি জোগান কিছুটা হয় ঠিকই। কাজেই এই ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ধরা যায় উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্য সামগ্রিক মূল্যের এক শতাংশের বেশী। কিন্তু ৩০ শতাংশের কম। প্রকৃত তথ্য যেহেতু নেই, খানিকটা অনুমান করতেই হবে। বিভিন্ন দেশে যেসব শস্যক্ষেত্র ইকোসিস্টেমের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে এবং গবেষণাপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের নিরিখে বলা যায়, সিঙ্গুরের ঐ জমির উৎপাদিত ফসলের বাজারমূল্য বড়জোর সামগ্রিক মূল্যের ৫ শতাংশ হতে পারে। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি, সিঙ্গুরের জমির একর প্রতি বার্ষিক প্রকৃত সামগ্রিক মূল্যের ৫ শতাংশের মান ১০ লক্ষ টাকা, অতএব সামগ্রিক বার্ষিক মূল্য হবে ২০০ লক্ষ বা ২ কোটি টাকা, একর প্রতি। এর ১৯৫ লক্ষ টাকাই অদৃশ্য মূল্য যা ইকোসিস্টেম পরিষেবাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর যেহেতু মোট ৬৪৫.৬৭ একর জমি শিল্পের জন্য ৯০ বছরের লিজ চুক্তিতে টাটারা পেয়েছিলনে অতএব ধরা যায় ঐ জমি অন্তত ৯০ বছর কোন ইকোসিস্টেম পরিষেবা দেবে না। তাই শিল্পের জন্য দেওয়া ঐ জমির সমগ্র মূল্য দাঁড়ায় ২X৯০X৬৪৫.৬৭ কোটি টাকা বা ১১৬২২০ কোটি

টাকা। এখানে ১০ লক্ষ টাকাকে একর প্রতি বার্ষিক মূল্য ধরাটা যুক্তিযুক্ত কেননা, নীতিগতভাবে, অন্তত ঐ (বাজার) মূল্যেই প্রতি বছর জমি এক কৃষক থেকে অন্য কৃষকে হস্তান্তরিত হতে পারতো।

এটা বলা ঠিক হবে না যে টাটাদের কাছে শিল্পের জন্য হস্তান্তরিত ঐ জমির মূল্য হওয়া উচিত ১১৬২২০ কোটি টাকা। কিন্তু এই হিসাবটা অন্তত এটুকু বুঝতে সাহায্য করে যে কৃষককে দেওয়া তথাকথিত 'ক্ষতিপুরণেরক্স অঙ্কটা তার ফসলের ক্ষতির সামান্য অংশ মাত্র, যে ফসল কৃষক বংশপরম্পরায় ভোগ করতে পারতেন। আর এই 'ক্ষতিপূরণে' প্রকৃত ক্ষতির ৯৫ শতাংশই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। এটা শুধু একটা ছোট ফাঁক বা ফাটল নয়, এক বিরাট গহ্বর, যা ভরাট করা দরকার।

সমাজের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, শিল্পের নয়

কৃষিজমি যখন এক কৃষক থেকে অন্য কৃষকে হস্তান্তরিত হয়, জমির চরিত্র অপরিবর্তিতই থাকে। ফসল উৎপাদন ছাড়া ঐ জমির সমস্ত প্রাকৃতিক (ইকোসিস্টেম) পরিষেবাগুলি অক্ষুন্ন থাকে। উৎপাদিত ফসল ঐ জমির কৃষক মালিক ভোগ করলেও প্রাকৃতিক পরিষেবাগুলির সুফল আগের মতোই এলাকার সমগ্র মানবগোষ্ঠী বা কৃষক সমাজ ভোগ করে, জমিটির চারপাশের পরিবেশ ভারসাম্য বজায় থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেঁচোরা উপরিমৃত্তিকা (topsoil) গঠন করতেই থাকে, জমির পুষ্টি ছড়িয়ে দিতেই থাকে এবং জল বাতাস চলাচলের জন্য মাটির গঠন, প্রবেশ্যতা ইত্যাদি ধর্ম বজায় রাখে। একটি হিসাবে অনুযায়ী কেঁচো বছরে হেক্টর প্রতি ১০ টন মৃত্তিকা নীচ থেকে উপরে স্থানান্তরিত করে।

কিন্তু এই জমি যখন শিল্পের জন্য রূপান্তরিত হয়, তার চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। জমিটির প্রাকৃতিক পরিষেবাগুলি ব্যাহত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের সুফল থেকে বঞ্চিত হয় স্থানীয় সমাজ এবং পরিবেশ। কাজেই এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ শুধু তাঁরাই হন না যাঁরা জীবিকার জন্যই সরাসরি কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকেন, বা কৃষিজাত দ্রব্যগুলিকে সংগ্রহ করা, বয়ে নিয়ে যাওয়া বা বাজারজাত করায় অংশ নেন, ক্ষতিগ্রস্থ হন তাঁরাও যাঁরা কোনভাবে ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে যুক্ত নন, কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে ও সমাজিকভাবে ঐ জমিকে ধারণ করে রাখেন। ক্ষতিগ্রস্থ হয় আশেপাশের অন্যান্য জমি জীবকুল জল ও বাতাস। কাজেই শুধুমাত্র জমির মালিককে বা কৃষিকর্মে সরাসরি নিযুক্ত অন্য মানুষদের বাজারদরে 'ক্ষতিপূরণক্স দিলেও, স্থানীয় গোষ্ঠী ও সমাজের এবং পরিবেশের ক্ষতির পূরণ কোনভাবেই হয় না। বরং এই ক্ষতি আরো ক্ষতিই ডেকে আনে।

কৃষিজমি যদি শিল্পের জন্য রূপান্তর করতেই হয়, তাহলে তিনদিক থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার - এক, কৃষক ও কৃষিকর্মীর জীবিকার ক্ষতিপূরণ, দুই, স্থানীয় সমাজ ও গোষ্ঠী (কৃষক-কৃষিকর্মী সহ) - তাদের সামাজিক পুর্নবাসন এবং তিন, তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা বা ন্যূনতম রাখার জন্য উপযুক্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। যদি শিল্পপতি বা অনুরূপ জমি-ব্যবহারকারীরা এইসব দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন, তাহলে স্পষ্টতই তাঁরা জমির সামগ্রিক মূল্যকেই গ্রাস করেন এবং লুকনো এই মূল্য তাঁদের মুনাফা ও পুঁজিতে প্রতিফলিত হয়। কারণ, এতদ্বারা শিল্পোৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবার উৎপাদনের খরচের অনেকটা 'বাইরেক্স চালান করে দেওয়া যায়, এবং মুনাফা অনেকটা বেশী করা যায়। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে ঐ শিল্পপণ্য বা পরিষেবার বিক্রয়মূল্য যতোটা হবার কথা ততটা হয় না এবং ক্রেতারাও একটা হিস্যা ভোগ করেন। শিল্প এলাকার সমাজ ও পরিবেশ প্রধানত দায়ভাগী হয়। এর উপর যখন আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে, পানীয় জলে টান পড়ে বা দূষিত হয়ে পড়ে, বাতাসেও পড়ে দূষণের নানা প্রভাব - তখন অবশিষ্ট জমির উৎপাদন কমতে থাকে, মানুষজনের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে, কর্মক্ষমতা কমে যায়। সেসবের মোকাবিলা যদি করতে হয়, তবে তার জন্যও খরচ করতে হয় ব্যক্তি নাগরিক এবং সরকারকেই। শিল্পপতির গায়ে আঁচড়টি লাগে না, তার মুনাফা আরও স্ফীত হয়।

কোন জমির মূল্যায়ণ এভাবে করলে, জমিটি উর্বর না অনুর্বর, একফসলি না বহুফসলি এসব অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব বিতর্কের আর কোন দরকারই পড়ে না। যেটা করা

দরকার তা হল জমির ''প্রাকৃতিক মূলধন ও ইকোসিস্টেম পরিষেবা''র বাস্তবসম্মত পুর্বানুমান। শস্য বা ফসল উৎপাদন এবং অন্যান্য পরিষেবার আপেক্ষিক অনুপাত বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি অরণ্য এবং একটি উপকূলীয় জলাজমির ক্ষেত্রে এই অনুপাতে যথেষ্ট পার্থক্য হতে বাধ্য। এক শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য শস্যক্ষেত্রেরও এই অনুপাতে পার্থক্য হতেই পারে। যেমন ধারা যাক সিঙ্গুরের কৃষিজমি এবং পস্থনগরের কৃষিজমি। এইসব হিসাবনিকাশের পন্থাপদ্ধতি এখন জানা হয়ে গেছে - কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা, ক্ষেত্র সমীক্ষণ ও নিবন্ধীকৃত তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে এই হিসাব করা খুবই সম্ভব, যদি আমাদের সেই সদিচ্ছা থাকে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানাদির এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য পরামর্শও সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

যে ক্ষতি অপূরণীয়

বাস্তুসংস্থান হিসেবে কৃষিজমি (বা অরণ্য বা উপকূলীয় জলাজমি ইত্যাদির) প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন না হলেও গভীর অনুভূতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীদের আন্দাজ উপলব্ধিতে তা বারবার ধরা পড়েছে, শিল্পে - সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটে আসেছে বহু দিন ধরে বহুভাবে। রবীন্দ্রনাথের ''দুই বিঘা জমি'' কিংবা ''ভূসম্পদের বিত্তহরণ'' (The Robbry of the Soil) -এরকমই দুটি উদারহণ। এই ধরনের চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন দেখা যায় জমির চরিত্রবদল - বিরোধী আইনে। ভারতে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এমন আইন বলবৎ আছে। এবং আইন ভেঙেই প্রায় সর্বত্রই বদলে যাচ্ছে অরণ্য, কিংবা উপকূল কিংবা কৃষিজমি - অবশ্যই পুঁজির ও ধনিকের স্বার্থে। জমির মোহে আবিষ্ট কৃষক, জমিকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, সে পরিবর্তনবিরোধী এবং সামন্তবাদী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন - এহেন কৃষক-মূল্যায়ণ এখনও বয়ে বেড়ানোর আর অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। কৃষকরাও প্রকৃতির জীবধাত্রীর পরিষেবা সম্পর্কে সংবেদনশীল যদিও তাঁরা হয়তো আত্মসাতের কায়দাকানুনটা ঠিক বুঝে ও যুঝে উঠতে পারেন না।

যখন জমি ও অন্যান্য বাস্তুসংস্থানের ভূমিকা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি স্কুলপাঠ্য বইতেও যখন সেই জ্ঞান ও তথ্যাদি পরিবেশন করা হচ্ছে, তখনও শতাব্দীপ্রাচীন মূঢ় আইনের সাহায্যে বলপূর্বক কৃষক ও অন্যান্য চিরাচরিত ভূসম্পর্কিত মানুষজনকে বিচ্ছিন্ন করে শিল্পের জন্য জমিকে রূপান্তরিত করায় নির্বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারছে বিভিন্ন রকমের সরকার - এটা খুব আশ্চর্যের ও পারিতাপের বিষয়।

ভারতে ''জমি অধিগ্রহণ'' এবং ''স্থানান্তরণ ও পুনর্বাসন'' সংক্রান্ত দুটি নতুন আইন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এমনকি প্রস্তাবিত এই আইনেও অধুনালব্ধ জ্ঞানের পুরো স্বীকৃতি মেলেনি। কৃষককে জমির ভবিষ্য-মূল্যের (অর্থাৎ রূপান্তরের পরে যে বাজার-দাম হবে) নিরিখে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব করে এবং উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করে নবলব্ধ জ্ঞানের খানিকটা স্বীকৃতি দিতে চাইলেও, পরিবেশের ক্ষতিপূরণের দিকটায় ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। এমনকি নতুন প্রস্তাবিত অইনও সমকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, প্রকরণ ও পদ্ধতির সদ্ব্যবহারে ব্যর্থ হতে চলেছে।

অন্যান্য জমিকে শিল্পের জমিতে পরিণত করতে গেলে জমির সূত্রেই যে একটি উদ্বৃত্তমূল্যের উদ্ভব হয় সেটা বোঝার ও মেনে নেবার সময় এসে গেছে। কৃষির তুলনায় শিল্পে আয় বেশী হবার রহস্য লুকিয়ে আছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিরাট মূলধনকে শিল্পে আত্মসাৎ করার মধ্যে, এবং ইকোসিস্টেম তথা পরিবেশ পরিষেবাগুলোকে বেমালুম গায়েব করে ফেলার মধ্যে। এখনই যদি এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে গোলার্ধের দক্ষিণের শিল্প বুভুক্ষু নিরেট সরকারগুলি দ্রুত আর্থিক প্রগতির(দীর্ঘমেয়াদী সামগ্রিক উন্নয়নের নয়) ধুয়ো তুলে জমি-বুভুক্ষু আগ্রাসী পুঁজির হাতে জমির উপঢৌকন দিতেই থাকবে, হোমো স্যাপিয়েনসের একমাত্র বাসস্থান এই পৃথিবীর ধ্বংস ত্বরান্বিত ও অনিবার্যই করবে তা।